ঢেঁকি

গ্রাম-বাংলার ঘরে ঘরে এক সময় ঢেঁকিতে ধান ভানার দৃশ্য চোখে পড়তো। গৃহস্থের বাড়িতে একাধিক ঢেঁকি থাকতো ঘরের পাশে বাড়তি একটি চাল দিয়ে তৈরী করা হত ঢেঁকি রাখার ঘর বা ঢেঁকিশাল। গ্রামের মহিলাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলতো কে কত ভোরে উঠে ঢেঁকিতে পা দিতে পারবে এবং কে কত বেশি ধান ছাঁটাই করতে পারে। কৃষক বধূর ঢেঁকির শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যেতো কৃষকের। গৃহিনী হাঁস- মুরগী ছেড়ে দিতেন। এগুলো ছুটে যেতো ঢেঁকিশালার দিকে খাদ্যের সন্ধানে। ভারানীদের তাড়া খেয়ে কক্ কক্ শব্দ করতে করতে পালাতো সেখান থেকে। ধান ভানার সময় মহিলাদের হাতের চুড়ির ঝনঝন শব্দ হত। শব্দ হতো পায়ের নুপুরের। সব মিলিয়ে সৃষ্টি হতো এক সঙ্গীত মুখর পরিবেশ।

গ্রামে এখন আর ঢেঁকির চিহ্ন খুজে পাওয়া যায় না। শোনা যায় না ঢেঁকির ঢেঁকুর ঢেঁকুর শব্দ। অথচ ৩০/৪০ বছর আগেও গ্রাম অঞ্চলের প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই ঢেঁকি ছিল। ছিল কালের আধুনিকতার ছোঁয়ায় গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য ঢেঁকি এখন বিলুপ্তি প্রায়। নতুন ধান ঘরে ওঠার আগেই গ্রাম্য বধুরা ঢেঁকি মেরামতে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। ঢেঁকি ঘর লেপে পুছে প্রস্তুত করে রাখতেন তাঁরা। ঘরে ঘরে চিঁড়ে কোটা চাল ও চালের গুঁড়ো করার প্রস্তুতি চলতো। বাড়িতে আত্মীয়, কুটুম এলে শীতকালে পিঠে তৈরীর জন্য ধুম পড়ে যেত। গ্রামের বধুরা ভীড় জমাতেন ঢেঁকি ঘরে। এমন এক সময় ছিল যখন ঢেঁকি গৃহস্থালীর নিত্য প্রয়োজনীয় সমগ্রীর মধ্যে অন্যতম প্রধান উপকরন। এটি ছিল গৃহস্থ বাড়ির একটি অংশ। গৃহিণীরা ঢেঁকিতে ধান ভেনে চাল তৈরী করতেন। ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত পালা করে চলতো তাদের ধান চালের গুঁড়ো তৈরীর কাজ। ঢেঁকি যারা চালাতেন, তাঁদের বলত ঢেঁকিবৌ। গ্রামের গরীব মেয়েরা গৃহস্থের বাড়িতে ধান ভেনে চাল তৈরী করে বা গুঁড়ো করে দিতেন। বিনেময়ে পারিশ্রমিক বাবদ পেতেন চাল। ঢেঁকিতে তারা পালা ক্রমে পাড় দিতেন। ঢেঁকির ঢেকুর ঢেকুর মিষ্টি মধুর শব্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মনের সুখে গুন গুনিয়ে গানও গাইতেন ‘ও ধান ভানিরে ধান ভানি, ঢেঁকিতে পাড় দিয়া / ঢেঁকি নাচে আমি নাচি হেলিয়া-দুলিয়া, ও ধান ভানিরে....’ চলতো পান খাওয়ার আড্ডা। এখন আধনিকতার যান্ত্রিক যুগে ঢেঁকির সঙ্গেই হারিয়ে গেছে গ্রাম্য বধুদের মনের সেই আবেগ। গান গেয়ে, গল্প করে ঢেঁকিতে পাড় দেবার শ্রম লাঘব হত।

ঢেঁকি নিয়ে আছে কত কথা, কত গল্প, কত প্রবাদ, কত ছবি :
ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে
ঘরের ঢেঁকি কুমির হলে?
লোকে উপরোধে ঢেঁকি গেলে
অকম্মার ঢেঁকি
হুকোটি বাড়ায়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে বেটা বুদ্ধির ঢেঁকি - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রিয়ে, তোমার ঢেঁকি হলে যেতেম বেঁচে

রাঙা চরণতলে নেচে নেচে॥
ঢিপ্‌ঢিপিয়ে যেতেম মারা, মাথা খুঁড়ে হতেম সারা —
কানের কাছে কচ্‌কচিয়ে মানটি তোমার নিতেম যেচে॥ - রাগ: রামপ্রসাদী, তাল: দাদরা / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, http://www.youtube.com/watch?v=3ct4lt9zRFk

“ও-দেশে ছুতোরদের মেয়েরা ঢেঁকি দিয়ে চিঁড়ে কাঁড়ে। একজন পা দিয়ে ঢেঁকি টেপে, আর-একজন নেড়ে চেড়ে দেয়। সে হুঁশ রাখে যাতে ঢেঁকির মুষলটা হাতের উপর না পড়ে। এদিকে ছেলেকে মাই দেয়, আর-একহাতে ভিজে ধান খোলায় ভেজে লয়। আবার খদ্দেরের সঙ্গে কথা হচ্ছে, ‘তোমার কাছে এত বাকী পাওনা আছে দিয়ে যেও।’ ⋯ ঈশ্বরেতে মন রেখে তেমনি সংসারে নানা কাজ করতে পার। কিন্তু অভ্যাস চাই; আর হুঁশিয়ার হওয়া চাই; তবে দুদিকে রাখা হয়।” - শ্রীরামকৃষ্ণ

“আমি ভাবি কি, যদি পৃথিবীতে ঢেঁকি না থাকিত, তবে খাইতাম কি? পাখীর মত দাঁড়ে বসিয়া ধান খাইতাম? না লাঙ্গুলকর্ণদুল্যমানা গজেন্দ্রগামিনী গাভীর মত মরাইয়ে মুখ দিতাম? নিশ্চয় তাহা আমি পারিতাম না। নবযুবা কৃষ্ণকায় বস্ত্রশূন্য কৃষাণ আসিয়া আমার পঞ্জরে যষ্টিপাত করিত, আর আমি ফোঁস্ করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া শৃঙ্গ লাঙ্গুল লইয়া পলাইতাম। আমি এই পরোপকরারনিরত ঢেঁকিকে আর্য্যসভ্যতার এক বিশেষ ফল মনে করি। আর্য্যসাহিত্য, আর্য্যদর্শন আমার মনে ইহার কাছে লাগে না। রামায়ণ, কুমারসম্ভব, পাণিনি, পতঞ্জলি, কেহ ধানকে চাল করিতে পারে না। ঢেঁকিই আর্য্যসভ্যতার মুখোজ্জ্বলকারী পুত্র, শ্রাদ্ধাধিকারী, নিত্য পিণ্ডদান করিতেছে। শুধু কি ঢেঁকিশালে? সমাজে, সাহিত্যে, ধর্ম্মসংস্কারে, রাজসভায়, কোথায় না ঢেঁকি আর্য্যসভ্যতার মুখোজ্জ্বলকারী।

"ঐ রমণীপাদপদ্ম! ধপাধপ পাদপদ্ম পিঠে পড়িতেছে, আর ঢেঁকি ধান ভানিয়া চাল করিতেছে। উঠিয়া পড়িয়া ঢক ঢক কচ কচ! কত পরোপকারই করিতেছে! হায় ঢেঁকি! ও পায়ের কি এত গুণ! পিঠে পাইয়া তুমি এই সাত কোটি বাঙ্গালিকে অন্ন দিতেছ - তার উপর আবার দেবতার ভোগ দিতেছ! ..... আবার শুনিতে পাই, তোমাদের একটি বিশেষ গুণ আছে নাকি?-ঘরে থাকিয়া নাকি মধ্যে মধ্যে কুমীর হও? আর ভাই ঢেঁকি, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি - মধ্যে মধ্যে স্বর্গে যাওয়া হয় শুনিয়াছি, সত্য সত্যই কি সেখানে গিয়াও ধান ভানিতে হয়? কোথাও আইনকারক ঢেঁকি, মিনিট রিপোর্টের রাশি গড়ে পিষিয়া, ভানিয়া বাহির করিতেছেন। আইন বিচারক ঢেঁকি সেই আইনগুলি গড়ে পিষিয়া বাহির করিতেছেন - দারিদ্র, কারাবাস-ধনীর ধনান্ত-ভাল মানুষের দেহান্ত। ..... স্বর্গে গিয়া, দেবরাজকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, "হে দেবেন্দ্র! আমি শ্রীকমলাকান্ত ঢেঁকি-স্বর্গে ধান ভানিব।" দেবেন্দ্র বলিলেন ..." - বঙ্কিম রচনাবলী

"ঢেঁকি লক্ষ্মীর বেত্তান্ত" - কুলদা রায় http://www.sachalayatan.com/porimanob/43484

হীরাবাড়ি আমার বাবার মামাবাড়ি। সে বাড়ি ভরা বাগান। বাগান থেকেই গাবগাছটি কেটে আনা হল। ফলমন্ত গাছ। তখনো পাকা গাব ধরে আছে। বাবার মেজো মামী একটু গাইগুই করে করেছিল। বাবামশাই হীরাবাড়ির সবেধন একমাত্র ভাগ্নে। চাইলে আমগাছটাও কেটে আনা যায়। মামীর দিকে চেয়ে বাবার মেজো মামা হুক্কা মুখ থেকে নামিয়ে শুধাল, কি করবি গাছ দিয়া?

বাবা গাছের গোড়া কাটতে কাটতে বলে দিল, পুকুরে ফেলব।

সুতরাং গাছটি কাটা হল। ডালপালা ছেটে বাবার মামারা কাঁধে করে গাবগাছটি আমাদের পুকুরেই ফেলে এল। পুকুরে পড়ে শব্দ হল—ঝপ্পাৎ। আমরা গাব খেতে খেতে বললাম অ বাবা, এইবার কী করবা?

বাবা বলল, ঝপ্পাৎ।

গাছটার কথা এইভাবে শেষ হয়ে গেল। আর কিছু নয়। জলের মধ্যে তলিয়ে গেলে সব কিছু গলে যায়। তারপর নাই।

এর মধ্যে আমাদের বাড়ি বদল হয়েছে। দোতলা থেকে আমরা প্রভু যীশুর গোয়াল ঘরে উঠে এসেছি। দাড়িয়াল রামকৃষ্ণর ছবির উপরে কার্ল মার্কসের ছবি বসেছে। রান্না ঘরটি ভেঙে আনা হয়েছে। হীরাবাড়ির বাঁশঝাড় থেকে বাবার মামারা খুশি মনে বাঁশ কেটে দিয়ে গেছে। সেই বাঁশ ছেঁচে ছুঁচে হয়েছে রান্না ঘরের খুঁটি। তার উপরে চাল। চালে পোড়া মাটির টালি। চারদিকে দরমার বেড়া।

এর মধ্যেই কদিন পরে পুকুর থেকে তোলা হল গাবগাছটি। ততদিন গা থেকে বাঁকলগুলো খসে গেছে। বেরিয়ে পড়েছে কাঠের কঙ্কাল। আর বাকলপচা গন্ধ। কদিন ছায়ার মধ্যে পড়ে থাকল। গন্ধ যেদিন উবে গেল—সেদিনই হরিদাস পিসেমশাই এলেন। গাবগাছটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। একটি কুড়াল দিয়ে কেটে কুটে গড়ে ফেললেন ঢেঁকি। ঢেঁকির মাথার দিকে মোনাই। কামার বাড়ি থেকে আনা হল লোহার খাড়ু। আর নোটটি তৈরী হল মাটির কলসির ভাঙা চাড়া দিয়ে। লেপে পুছে সত্যি সত্যি আমাদের রান্না ঘরের পশ্চিম ধারে ঢেঁকি বসল। বাবা মাকে বলল, এই নেও তোমার ঢেঁকি। দেখে মায়ের চোখে জল। জীবনে আর কিছু নয়—একটি ঢেঁকির সাধ ছিল। নতুন বাড়িতে এসে পূর্ণ হল।

ঘুল্লীবাড়ির বালা ঠাকুরুণ সব টের পান। তিনি এলেন তেল সিন্দুর দিতে। তার নাকে নোলক দোলে। মাথায় লম্বা ঘোমটা। একটু বয়েস হয়েছে। চুল পাকে নি। তেল সিন্দুর মেখে গান ধরলেন --

তোমার ঢেঁকি হইলে যাইতেম বেঁইচে

রাঙা চরণতলে নাইচে নাইচে ॥

ঢিপ্‌ঢিপাইয়ে যাইতেম মারা, মাথা খুইড়ে হইতেম সারা—

কানের লগে কচ্‌কচাইয়ে মানটি তোমার নিতেম যাইচে ॥

দেবর্ষি নারদের বাহন ঢেঁকি। তাই বলে নারদ মুনি একেবারেই বুদ্ধির ঢেঁকি নন। বরঞ্চ চুকলি করে নর, দেব, দানবের মধ্যে ঝগড়া বাধাতে ওস্তাদ। ঢেঁকি শাক (Dryopteris filix-mas) দিয়ে কত রকমের রান্না, তার কত গুনের ব্যাখ্যা। ঢেঁকির স্থান হল ঢেঁকিশাল। কিন্তু স্থান বিশেষে তারও বিবর্ত্তন হয়েছে। রাড়ভূমিতে 'ঢেঁকিশাল' বিবর্ত্তনে দাঁড়ায় : ঢেঁকিশাল ⟶ ঢেঁকশেল ⟶ ঢেঁশকেল।

একসময় গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য ২ দিন ধরে ঢেঁকি উৎসব পালিত হত ব্যপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে।
বাংলাদেশের কেশপুরের মধ্যকুল গ্রামে, ২৩ থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি

কেমন করে মেশিন ছাড়া ধান থেকে চাল বের করা হতো? আসলে ধানের তুষ ছাড়িয়ে চাল বানানোই ছিল ঢেঁকির কাজ। ঢেঁকি প্রস্তুতকারীরা জানান, সাধারণত একটি ঢেঁকি তৈরী করতে প্রায় পাঁচশো'রও বেশি টাকা খরচ হয়। জাম ও কুল গাছের কাঠ দিয়ে তৈরী ঢেঁকিই সব থেকে ভালো হয়। অনেক সময় তা না পাওয়া গেলে কাঁঠাল কিংবা শাল কাঠ দিয়েও বানানো হয়। বাবলা, জান, গাব ইত্যাদি কাঠ দিয়েও ঢেঁকি তৈরী করা হতো। সাড়ে তিন থেকে চার হাত দৈর্ঘ্য এবং পৌনে এক হাত চওড়া। মাথার দিকে একটু পুরু এবং অগ্রভাগ সরু এর মাথায় এক হাত লম্বা একটি কাঠের তক্তা থাকে। একে বলে রেনু বা ছিয়া। এর মাথায় লাগানো থাকে লোহার গোলা। গোলার মুখ যে স্থানটি মাটি স্পর্শ করে তাকে বলে গড়। এটা চার পাঁচ ইঞ্চি গর্ত। গর্তের ভিতরে স্থাপিতহয় কাঠের একটি অংশ। অনেক কাঠের পরিবর্তে পাথর খন্ড ব্যবহার করেন। তবে যাই ব্যবহার করা হোক না কেন সেটি হয় খুব মসৃন। এই গর্ত্তের ভেতর দেয়া হয় ধান। ঢেঁকিতে ধান ভানতে সাধারণ দু'জন লোকের প্রয়োজন। একজন ঢেঁকিতে ধান দেয় আর গাড়ের (গর্ত্তের) ভিতর ধান নাড়াচাড়া করে। অন্যজন পাড় দেয়। অনেক সময় বেশী ধান হলে তা দু'জনের দ্বারা হয়ে ওঠে না, তখন তিনজন লাগে। দু'জন দু'জন একসাথে পাড় দেয়। একজনে ধান ওলট পালট করে দেয়। এভাবে কয়েকবার ধান পাড় দিয়ে খোসা আলাদা করার পর কুলো দিয়ে ধান ঝেড়ে পরিস্কার করতে হয়। তখন বের হয় চাল। এতে যথেষ্ট পরিশ্রমও বটে। ঢেঁকি দিয়ে এক সময় ধান ভানার কাজ হতো ব্যাপকভাবে। ঢেঁকি দিয়ে শুধু ধান থেকে চালই নয়, পিঠা তৈরীর জন্য চালের গুড়াও তৈরী করা হতো।

কালে, কালে ঢেঁকি :

মন্দির গাত্রের মূর্ত্তি, গাংপুর, ঘুরিশ, ইলামবাজার, পশ্চিম বঙ্গ।

গাঁয়ে গাঁয়ে ঢেঁকি :

ঢেঁকিকে নিয়ে গান ও প্রবাদ প্রচলিত থাকলেও ঐতিহ্যবাহী সেই ঢেঁকি এখন প্রায় বিলুপ্তির পথে। এক সময়ে গ্রাম বাংলায় বহুল ব্যবহৃত এই উপকরণটি হারিয়ে যেতে বসেছে। কালের আবর্তনে যন্ত্রের আবির্ভাবে আজ ঢেঁকির এই বিলুপ্তপ্রায় অবস্থা। এখন আর গ্রাম বাংলায় ঢেঁকিতে ধান ভানার দৃশ্য চোখেই পড়ে না। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে দু-একটি বাড়িতে ঢেঁকি থাকলেও, তা দিয়ে সেভাবে কাজ করা হয়না। ফলে বর্তমানে এই ঢেঁকি 'অকম্মার ঢেঁকি'তে পরিণত হয়েছে। কিন্তু পৌষপার্বণের পিঠে পুলির সময় আসতেই তার কদর বেড়ে যায়। গ্রামের মহিলাদের মতে মেশিনে পেষা চালের গুড়োর চাইতে ঢেঁকিতে কোটা চালের গুড়ো দিয়ে তৈরী পিঠের স্বাদ অনেক বেশি। তাই পিঠে পুলি খাওয়ার এই মরসুম আসতেই হারিয়ে যেতে বসা ঢেঁকির মাথায় তেল-সিঁদুর মাখিয়ে চলছে তার ব্যবহার।

কিছুকাল আগে, সল্ট লেকে এক রাজস্থান মেলা হয়। তাতে দেখলাম এক ঢেঁকি বসেছে, কিন্তু ধান ভানার জন্য নয়, মশলা কোটার জন্য। ঢেঁকিবৌ দুজন, তারাই আবার salesgirls, তারাই সেখানে উনুন জ্বেলে রান্না করে খায়। বেশ কিছু গিন্নী নানারকম কোটা মশলা কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। ঢেঁকিবৌদের দুর্বোধ্য ভাষা ও দু একজন গিন্নীর কথা থেকে বুঝলাম বাজারের রঙ্গিন প্যাকেটে পাওয়া নামজাদা কোম্পানির গুঁড়ো মশলার চেয়ে এই ঢেঁকিতে কোটা গুঁড়ো মশলা নাকি বেশী স্বাদু। আমার ধারনা ছিল, গুঁড়ো মশলার চেয়ে বাঁটা মশলায় রান্নার স্বাদ বেশী ভাল হয়, কিন্তু রান্নায় দড় নই বলে চুপ করে রইলাম। পরে খোঁজ করে জেনেছি আমার ধারনাই সঠিক। তবে কি না আজকাল মশলা বাঁটার লোকের অভাবে বেশীর ভাগ বাড়িতেই শিল নোড়ার পাট উঠে গেছে। উপরন্তু, প্যাকেটের গুঁড়ো মশলা ঘরে অনেকদিন রেখে দেওয়া যায়, নিত্য বাঁটা মশলা বেশীদিন তাজা থাকে না।

কিন্তু জমানা বদলেছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, চালের যা গুণ ওই ঢেঁকিছাঁটা চালে। দোকানের মিলে ছাঁটা চকচকে চাল দেখতে যতই ভাল হোক, খাদ্যগুণ কিছুই নেই। কিছু কিছু বাজারে লাল চাল বা ঢেঁকিছাঁটা চাল পাওয়া যেতে শুরু করেছে বটে, তবে সে নিতান্তই অল্প। বিজ্ঞানীদের বকুনির ঠেলায় যদি সত্যিই ঢেঁকিছাঁটা চালের চল বাড়ে, তবে আবার ঢেঁকিবৌদের সুদিন ফিরে আসবে, অর্থনৈতিক উন্নতি এক বড় ধাপ এগিয়ে যাবে – downward redistribution of wealth.